KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩৩/২ এ. বীরেন সেন সরণী, কল-৫
Collection : KLMLGK	Publisher মৃত্যুঞ্জয় সান্যাল (1, 2) অজিতকুমার সান্যাল (2/1)
Title অ (A)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 1 2 2/1 2/3 3/1	Year of Publication : Aug 1981 Nov 1981 Aug 1982 Feb 1983 Aug 1983
	Condition : Brittle Good ✓
Editor অজিতকুমার সান্যাল	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

অ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

দ্বিতীয় সংকলন
নভেম্বর ১৯৮১

সম্পাদিকা: শতরূপা সান্যাল

শ্রীচণ্ডী মণ্ডলকে 'অ'-এর পক্ষে
— জগদীশ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

অ

দ্বিতীয় সঙ্কলন নভেম্বর, ১৯৮১

সূচিপত্র

কবিতা-গুচ্ছ ঃ

তরুণ সান্যাল, তরুণ মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, নন্দিতা সেনগুপ্ত, শিখা ঘোষ, ঐন্দ্রিলা ঠাকুর, তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা পণ্ডিত, আলকামা শিবলি (উর্দু থেকে অনুবাদ তাপস তলাপত্র), জুলফিয়া ইজরাইলোভা (রুশ থেকে অনুবাদ নিখিল সেনগুপ্ত), অমিত শঙ্কর দাশ, শিলাদিত্য সান্যাল ৩—১২

প্রবন্ধ

বাংলাসাহিত্য- সংস্কৃতিতে উগ্রআধুনিকতা গৌরীশঙ্কর দাশ ২৭

বঙ্গদেশের দুইজন বিজ্ঞান সাধক/দেবনাথ বসু ৩০

গল্প

লুকনো মুখ/অমিতাভ দত্ত ১৩

অনেকটা কিছু গোয়ালার গলি-এর মতো/স্বর্ণেন্দু সেন ১৯

ফিরে দেখা/ মৌসুমী সিংহ ২১

চোখ/অভিজিৎ চক্রবর্তী ২৫

সংস্কৃতি সংবাদ ঃ

শতবর্ষে পিকাসো, লু শুন শতবর্ষ, মির্জো তুরসুন জাদা
শতরূপা সান্যাল ৩৪

প্রচ্ছদচিত্র পাবলো পিকাসো

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনাগুলির গ্রাহক হোন ও পড়ুন

সোভিয়েত দেশ

প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর সোভিয়েত জীবনের তথ্যসমৃদ্ধ সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা।

চাঁদার হার : ১ বছর ৩ বছর

বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ১০·০০ ২০·০০

ইংরাজী — ১২·০০ ২৩·০০

স্পুৎনিক দুনিয়র

তরুণ বয়েসীদের জন্য বহুবর্ণ চিত্রশোভিত মাসিক পত্রিকা। ছোটদের উপযোগী লেখায় সমৃদ্ধ। ইংরাজী ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

চাঁদার হার : ১ বছর ৩ বছর

৯·০০ ২৪·০০

সোভিয়েত সমীক্ষা

বিশ্বের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও তার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচনামূলক পত্রিকা। মাসে পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

চাঁদার হার : ১ বছর ৩ বছর

ইংরাজী, বাংলা, ওড়িয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ৬·০০ ১৪·০০

ইয়ুথ রিভিয়ু

ভারতীয় যুব সমাজকে সোভিয়েত যুব সমাজের অনন্য সাধারণ জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করানোর সচিত্র সাপ্তাহিক। ইংরাজী ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

চাঁদার হার : ১ বছর ৩ বছর

৬·০০ ১৪·০০

'সোভিয়েত দেশ' গ্রাহকরাই শুধু ১৯৮২ সালের একখানি সুন্দর ক্যালেণ্ডার উপহার পাবেন।

১লা নভেম্বর ১৯৮১ হইতে গ্রাহক চাঁদা গ্রহণ করা শুরু হবে। আমাদের হাতে ক্যালেণ্ডারের সংখ্যা সীমিতসংখ্যক। অতএব নিশ্চিতভাবে ক্যালেণ্ডার পেতে হলে অবিলম্বে গ্রাহক হোন।

আপনার পছন্দমত পত্রিকার নাম এবং কোন ভাষার পত্রিকার গ্রাহক হতে চান সেটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গ্রাহক চাঁদা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সরাসরি মনি-অর্ডার বা পোস্টালঅর্ডার যোগে পাঠান। অথবা আপনি নিজে শনি ও রবি বাদে অন্য যে কোনো দিন সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৩টার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের দপ্তরে আসুন এবং চাঁদা দিয়ে স্বহস্তে ক্যালেণ্ডার সংগ্রহ করুন।

সোভিয়েত দেশ,
১৮, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি,
কলকাতা-৭০০০১৯

টেলিফোন নম্বর :
৪৭-৭৫৬৪
৪৭-৭৬৬৬

প্রার্থনা

তরুণ সান্যাল

দেবাদিদেব মহেশ্বর, হে নটরাজ-ভৈরব প্রসন্ন হোন,এবার আমরা নৃত্য করব। পাহাড়ের ঢালে শুকনো পাথরে পা ডুবিয়ে গুল্ম, ব্রহ্ম ডাঙায় এখানে ওখানে নীলনীল চৈতক মেঘজটিল ব্যূহে এখন কদম বাড়াতে তৈরী, কোনো ডালে দোল খেয়ে যাওয়া ফিঙেটির ডানায় ঝড়ের আগে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাল্কা পদপাত, একটি উদাস পাতা পল্লবের ভারিমুখ যূথের পাশে একা একাই হরিণশিশু।

নটরাজ, এইতো নৃত্যের ঋতু, ঝলমল পায়েলের প্রতি গ্রন্থিতে এখন বৃষ্টি-পতনের কথক, ত্রিভঙ্গ দুটি আড়াআড়ি বাবরি চুলে তালগাছ কোমরে কোমরে ত্রিকোণ এঁকে ওড়িশি, এখনি ধূমকেতুমিব কেমতি করালম অশ্বক্ষুর, দূরে বনভূমি দুলে উঠেছে বজ্রের গুরু গুরু বোলে ভরতে। আমাদের পায়ে এখন সাত সমুদ্রের ডাঙায় আছাড় তুলসীমঞ্চের আড়াল করা প্রদীপটিও নক্ষত্রলোকে চলে যাবার জন্য তৈরি, এমন আত্মনিবেদন কার মন্দিরে।

ধূমজ্যোতিসলিলমরুতে এই মেঘদেহ, নাকি জীবন, যা ওষধিযু বনস্পতিষু প্রাণকোষ, দীপ্যমান নবনীললিত মাংসস্নায়ুতে অস্থিপুঞ্জ, হে পরম খাদক, আপনার জিহ্বায় উল্টেপাল্টে থাক এক পরম নৃত্য, তারপর সেই রসায়নে এক পাদ মাটিতে বিস্তৃত আপনার লিঙ্গচ্ছত্রিত বীজে জন্ম নিন কার্ত্তিকেয়, শরপুঞ্জে যিনি সূর্যালোক ঢেকে দেবেন, যিনি পার্বতীর স্বেদবিহ্বল দেহে প্রোথিত হয়েও চলে যাবেন ব্রাত্য কৃত্তিকাদের অনায়াস বিহ্বল গোপনে, ষড়মুখে তখন তাঁর ঊর্ধ্ব-অধর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নাকি ঈশানে নৈঋতে বায়ু ও অগ্নিতে, নটরাজ প্রসন্ন হোন, আমরা শহীদানে প্রস্তুত।

পাতাগুলি ঝরছে। প্রস্তুতি পর্ব শেষেও তিনি আসেন না। তৃণভূমি দণ্ডকলস গুল্মের গন্ধবিহ্বল বুটিতোলা এক পরম শয্যা। তিনি আসেন না। আকাশে এক দীর্ঘ রথচক্র ঘুরে যায় যার অরে অরে কিরাতিনীর অলঙ্করণে বনফুল, হে অরণ্যকিরাত, কোথায় আপনার পাশুপত, আসুন আমরা দাবি করি এই নিহত বরাহ, এই ঘোর দন্তী বাঁউৎসা অথচ প্রাণরসের যা চাবিকাঠি, বরাভয় নয়, আসুন বাণমুখে ঘর্ষণে ঘর্ষণে ফুলিঙ্গ কর্ষণে নৃত্যে মাতি তা-তা থৈ, পায়ে আমাদের পিতৃলোক থেকে উড়ে আসা গগণচারীদের ডানার পিস্টন, বুকের মধ্যে ট্রাফিকের লালচোখের সামনে শত শত চিতার গরগর, হে দেবাদিদেব, হে নটরাজ ভৈরব, প্রসন্ন হোন, আমরা এই সুন্দরী গ্রহভূমিতে মাটিতে সেঁধোনো পায়ে কখনো বা উল্লাসে উত্থিত তা-থিয়া তা-থিয়া ডিমি-ডিমি শেষবারের মতো নৃত্য করি।

নটরাজ, হে ভৈরব, কৃপা করুন, প্রসন্ন হোন।

প্রত্যেক মানুষ এবার

তরুণ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক মানুষ এবার জেনে গেছে তার সীমা, জেনে গেছে
কতটা তার স্থিতি, কপা এগোলে ধ্রুবসত্যে ডুবে যায়
মানুষিক রাগ, অভিমান, দ্বেষ ; কিংবা ভুল ক'রে চৌরাস্তার
মোড়ে দাঁড়ালে কিরকম দুঃখ ও শোক বুকের ব্যথা
জরুরী করে তোলে,
পৃথিবীর আলো ও বাতাস পেয়ে কেমন বাঁচতে চায় মুমূর্ষু
মানুষ, কেমন তার হাতের পাঁচ আঙুল আঁকড়ে ধরতে চায়
আকাশ ; কী মারাত্মক ভালোবাসা তাকে টেনে নিয়ে যায়
সেই ধ্রুবমৃত্যুর দিকে, কী প্রচণ্ড ক্ষোভে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
কেঁদে ফেলে বিপন্ন মানুষ ; গোপন ইচ্ছা ও বিশ্বাসে সে
জ্যোতিষীর কাছে মেলে ধরে তার করপত্র ; পথের ধুলো থেকে
সোনা ভ্রমে তুলে নেয় বালি ও অভ্র, ঘুমের মধ্যে চুম্বন করে
কোনো চেনা যুবতীর ধপ্‌ধপে পা—ঘুম ভেঙে গেলে ক্রোধে
জ্বলে ওঠে মানুষ, আর তছনছ করে চেয়ার টেবিল, ঘরবাড়ি ;
গভীর যন্ত্রণায় পাহারা দেয় নিজের নিঃসঙ্গতা ; নীল আকাশের
সামনে দাঁড়িয়ে দাবি করে ভালবাসার চিঠি ; নীল সূর্যোদয় দেখে
তৃপ্তি পায় মানুষ—মনে পড়ে শিশুমুখ ; যৌনতাকে ব্রহ্মাস্বাদ ভেবে
ঠোকা মেরে ছুঁড়ে ফেলে চায়ের ভাঁড়, সিগারেটের পোড়া টুকরো ;
ধাবমান রিক্সার হুড্ চেপে প্রশ্ন করে : 'এই রিক্সা যাবে ?'
নদীর উপর ব্রীজ দেখে উদাসীন হয়ে যায় মানুষ ; নিজেকে
ভীষণ দুর্বল ও অসহায় ভাবে পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাস ঘেঁটে
জেনে যায় তার নিজস্ব সীমা, জেনে যায় কতটা তার স্থিতি···

এরকম দোলাচলে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক মানুষ জেনে যায় তার
নিজস্ব সংবাদ--

স্বপ্নের মতো তার চোখে ভেসে ওঠে কত স্মৃতি, নষ্ট নির্মাণ,
বাগান, পুকুর, ঘরবাড়ি এবং প্রিয় গানের কলিগুলো মনে পড়ে ;
আচমকা রোদ কমে গেলে বড় ভয় পায় মানুষ ; বড় ভীতু হয়ে পড়ে ;
ছেঁড়াখোঁড়া জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে মানুষের বড় দ্বিধা হয়,
হাজার মাইল পথ ভেঙে ছুটে যায় মানুষের সাদা ঘোড়া—
এক ধ্রুবসত্য স্থির হয়ে যায় মানুষের শক্তি ও হানাহানি
এবং এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে প্রত্যেক মানুষ জেনে যায়
বড় সকরুণ ভাবে জেনে যায়
: তাদের হাতের মুঠোয় কোন বাঘনখ নেই।

খুঁজতে

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে স্তব্ধ হলো সব কবরের আকাশে।

ঝুলন্ত বাদুর, সহচরী শব,
নষ্টনীলে ভেসে থাকা চাঁদ,
শুকনো পাতা, ঝরা ফুল,
দক্ষিণ সমুদ্রের জেলে
হিমালয়ে, নদীতে, হিজলের বনে,
ঘাসে আর জঞ্জালের শহরে
জোড়া বেঁধে বেঁধে আশ্রয় খুঁজে
নিয়ে নীরব হলো।
আর, আমি একা আমি একা আমি
আঁধার হাতরে শেষে, আমারই কাছে
এসে বললুম 'প্রেম দাও'।
গাণিতিক আদুর আবেশে তাই
ভেসে থাকি, বেঁচে থাকি আজও।

এবং দেখি,
এখনো বিচিত্র জীবন বিভিন্ন অক্ষতলে
কিছুমিছু খোঁজে :
নিজেকেই পায়।

দৃশ্যপট

নন্দিতা সেনগুপ্ত

শীতের বিকেল ক্রমে নেমে আসে ঘন হয়ে আকাশের মেঘগুলো ছুঁয়ে।
বারান্দায় বসে আছি বর্ণময় সন্ধ্যাবেলা একা।
চোখে পড়ে রাশি রাশি মানুষের মুখ,
পশমের উজ্জ্বলতা এনে দেয় স্বস্তির প্রলেপ
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে ওঠে সুখ।

ক্রমে ক্রমে রাত নেমে যায়।
পরিচিত দৃশ্যপট বদলে বদলে যায়
শীতার্ত শিশুর কান্না আমাদের ঘুম কেড়ে নেয়।

এত রাতে মশালের আলো !

উজ্জ্বল আলোকবৃত্তে কিছু ছায়া শরীরের ভিড়,
নিজেদের হৃদয়ের যে অস্ফুট ভাষা
ওরা কি তা বোঝে ?
তাই আজ নিশ্চিত আরামে
ম্লান এই বৃত্ত ঘিরে পরস্পর পরস্পর মাঝে,
এতটুকু নির্ভরতা এতটুকু উত্তাপ খোঁজে।

রাতের স্বাক্ষর

শিপা ঘোষ

কাল রাত ছিলো স্তব্ধ নিথর
কাল রাত, আয়ুহীন বায়ুহীন
পৃথিবীর বুকে যন্ত্রণা ছিলো
যেন শ্বাসরোধী মৃত্যু আসবে।
আমার মশারির নীলে
আগের মতোন ঢেউ জাগেনিতো
প্রাণ খুঁজে নেয়া মশকের দল
নোনা রক্তের আস্বাদে মাতে নি
কাল রাতে কাল স্তব্ধ রাতে।
অভ্রান্ত জ্যোতিষীর আশ্বাস ছিল
মাথার উপরে
আমার মৃত্যু নেই
অজয়, অমর, অক্ষয়—'আমি'—

এই মৃত্যুর অপেক্ষমান রাতে
আমার দলিলে আমি স্বাক্ষর রেখেছি
কাল রাতে—
কাল স্তব্ধ রাতে—
আমার অমরত্বের স্বাক্ষর।
আগামী দিনের প্রত্নতত্ত্ববিদ
পৃথিবীর শবদেহে খুঁজে পাবে
নতুন পৃথিবী, যেখানে
পৌঁছে যাব এই আজকের আমি।
তারই শিলান্যাস—কাল স্তব্ধ রাতে
কাল রাত ছিলো
স্তব্ধ রাত ছিলো
আয়ুহীন বায়ুহীন।

হায় সেকি শুধু স্বপ্ন

ঐন্দ্রিলা ঠাকুর

হায় সেকি শুধু স্বপন !
এতদিন যাকে রচনা করেছি,
ফুলের বাগান উজাড় করেই
বিছিয়েছিলাম আসন।
দূর গগনের নীলিমায় বুঝি
দুটি চোখ তার আঁকা,
দক্ষিণ হাওয়া বাঁশির ছন্দ—
কার হাসি ধুলি ঢাকা।
আকাশের নীলে, বাতাসের দোলে,
অনুভব করি যাকে
মানুষের ভিড়ে স্বপন তাকাই
পলকে হারাই তাকে।
প্রকৃতির পটে আকাশ তো আছে
আছে দক্ষিণ হাওয়া।
তবে কেন তাকে খুঁজেও না পাই
শুধু কি স্বপ্ন চাওয়া।

বাসনার হাতছানি

সুপ্তি চট্টোপাধ্যায়

অনেক চাওয়ার মাঝে হারিয়ে গেছে ছোট্ট একটা চাওয়া
খুব ছোট্ট,
আমি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলাম,
যেন ধূ-ধূ জলরাশির মাঝে ভেসে থাকা সবুজ এক দ্বীপ
হাতছানি দিয়ে ডাকত সুনসান দুপুরে,
মনকেমন করা সন্ধ্যায়

আমি চেতনার জানলায় মুখ রেখে বলতাম চুপি চুপি
ডিঙাটি ভাসাতে দেরী নেই।

ঘুসর এক সায়াহ্নে আমার ভুল ভেঙে গেল
দূরের সেই ডাক দিয়ে যাওয়া দ্বীপটা
হারিয়ে গেল সীমাহীন কল্লোলের মাঝে।

মনে পড়ে

নীলাঞ্জনা পণ্ডিত

আজকে পড়েছে মনে—
কোন বসন্তে হারিয়েছিলাম
দিগন্ত ছোঁয়া সুবিপুল মাঠে অজানা গাছের বনে।

দুপুরের হাওয়া জানে
এপৃথিবী কেন সবুজে সবুজ
কেন আনন্দ এমন জীবনে এ সব কেনর মানে।

আজও সারারাত দেখি
ঝিনুক রঙের রূপালি তারারা
সেদিনের মতো আজও ফুটে আছে তার মনে পড়ে সেকী ?

ফেব্রুয়ারীর প্রথম সন্ধ্যায়

আল্‌কামা শিবলি

ফেব্রুয়ারির প্রথম সন্ধ্যায়
রাইটার্স বিল্ডিংসের কয়েক মুহূর্ত আগে
রাস্তার ধারের মিত পরিসর কোণটিতে
পড়ে আছে একটি যুবক—

বুকের কাছের জামাটি তার রক্তে ভিজে চপ্‌চপে
মুখে কুঞ্চিত বলীরেখা মৃত্যুর রূঢ় অভিশাপে
হাতের মুঠোয় তার এক চিলতে কাগজ
সম্ভবতঃ কোনো অমূল্য ইশারা
হয়তো—
একটি পুতুলের
চকোলেটের
বা লাকটোজেনের কথা
বই পেন্সিল খাতা
হাতের বালা, চোখের সুর্মা
লিপস্টিক আর চা পাতা

এবং অবশেষে জমাট রক্তপাতে
ইতিহাস লেখা হল এক
রাইটার্সের ফুটপাতে

উর্দু থেকে অনুবাদ : তাপস তলাপাত্র

গান

জুলফিয়া ইজরাইলোভা

আমি তোমারই গান গাই বোন
তোমারই গান গাই।
প্রেমে ভর-পুর টই-টম্বুর—
আমার হৃদয় ;
আর আমি গান গাই বোন,
আমার দেশের মাটির,
উপরের নির্মেঘ আকাশের।

শাদা ধবধবে তুলোর ক্ষেত
দূর দিগন্তে রয়েছে পাতা
মাঠে মাঠে ভরা তুলোর ফসল
তোলা হবে মদ চোলায়ের দিনে !

ছড়িয়ে দাও তুলো, গুটি থেকে তুলো
নাও নিপুন হাতে। ছড়িয়ে দাও সযত্নে
আমি বোন গান গাই তার,
গান গাই বিশাল ক্ষেতের।

সূর্য ওঠার আগেই তুমি উঠে পড়ো
বেরিয়ে পড়ো
আঁধার থাকতেই।
আকাশের তারাগুলি যখন যায়
ডুবে একে একে
ক্ষেতের কাজে তুমি তখন নজর রাখো।

গর্বিত তোমার জন্য, আমি বোন গর্বিত
দেশের লোক করেছে তাই তোমার কাজের তারিফ
একদা যা ছিল ধূসর মরু, অনুর্বর
তুমি তাতে আজ ফলালে সোনা

রুশ থেকে অনুবাদ : নিখিল সেনগুপ্ত

আবর্তন

অমিতশঙ্কর দাশ

আকাশ মাটি সাগর এবং দিন
সাজ বদলায় যেন রঙের খেলায়
জীবন শুধু ধূপের মতো পোড়ে
প্রত্যুষে হোক কিংবা সাঁঝের বেলায়।

বিষণ্ণ দিন কোন ফাঁকে যায় চ'লে
শরৎ মেঘে আলোর আঁচল ওড়ে
আপন বৃত্তে বিশ্ব ঘুরেই চলে
জীবন শুধু পোড়ে শুধুই পোড়ে।

গঙ্গার কাছে

শিলাদিত্য সান্যাল

কোথায় গঙ্গোত্রী হিমবাহ — গঙ্গা ছিলে কঠিন জমাট
সগর সন্তানদের দাহ — ঘোচাতে শ্যামল ধূ-ধূ মাঠ।
ভগীরথ বাহিনী হে নদী — নরলোকে পবিত্র জাহ্নবী
বয়ে যাও সাগর অবধি — তীরে তীরে এঁকে শ্যাম ছবি।
তবু বন্যা ভাসায় জীবন — জল নেমে গেলে পচা কাদা
মৃত্যুর পরেও অগনন — শস্যের সোনায় সুর সাধা
নদী হয়ো উৎসবের নদী — মানবিক প্রবাহ ধারার
শুধু বন্যা স্রোত হও যদি — ফিরো উৎসে হিম পাহারার।

যাযাবরী

শতরূপা সান্যাল

বৃষ্টিশেষের নীল আকাশে পায়রা ডানা
শ্বেত ধবধব নন্দাদেবী দেন পাহারা
দুপুর বেলা ঘন্টিবাজে মোষের গলায়
নিঝুম রাতে একলা ছাতে তারায় তারা

এমনি আমার ঝড়ের ডাকে ঘুর্ণি জাগে
হাতছানি দেয় ছাউনি তাঁবু বানজারাদের
বৈরাগীদের মেঠো সুরের একতারাতে
মুশকিলাসান আলখাল্লা ঘরছাড়াদের।

পঙ্কীরাজের মেঘপাখা যায় আকাশ পথে
বেদের বলের গৌরী ধুলো হাওয়ায় ওড়ে
জ্যোৎস্না পিছল রক্তে আমার মাদল বাজে
পথ ডাকছে বাঁশী ডেকেছে মাতাল ক'রে

লুকনো মুখ

অমিতাভ দত্ত

অফিস টাইম। জ্যামে বাস দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের সিটে তিনজন করে বসে আছে অফিসবাবুরা। পিছনে ঠাসাঠাসি ভীড়। এই বিরক্ত উদ্বিগ্ন মানুষগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সুজয়। তাদের ভ্রূক্ষেপহীন মুখগুলোকে নিজের দিকে ফেরানোর তাগিদে সে আরেকবার বললে, 'আমার কাছে আর মাত্র কয়েক প্যাকেট আছে। কোন দাদার লাগলে বলবেন। তিন তিনটে প্যাকেট পাচ্ছেন মাত্র একটাকায়। একটাকা। একটাকা। একটাকা। একটাকা।'

নাঃ—কেউ নেই। কারোর সঙ্গে চোখাচোখিও হয় না সুজয়ের। নির্বিকার উদাসীন সব মুখ। এদের কাছে জনজীবনের সমস্ত যান্ত্রিক শব্দগুলোর সঙ্গে—কবে কোন অনাদিকাল থেকেই যেন একাকার হয়ে গেল সুজয়দের গলা।

শুকনো ঠোঁটে জিভ্ বুলোয় সুজয়। হাতের প্যাকেটগুলো কাঁধের ঝোলায় পুরে আস্তে আস্তে ভীড় ঠেলে রাস্তায় নেমে পড়ে।

ডানদিকে জানলার ধারের একটা সিটে অবনীশদা বসেছিলেন। হাতের ব্যাগটাকে এমনিভাবে মুখের কাছে ধরেছিলেন যাতে সুজয় দেখতে না পায়। অথবা অবনীশদাই যেন সুজয়কে দেখতে পায় নি। হাসি পেল সুজয়ের। মনে মনে খুব একচোট হেসে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সে।

সুজয় যখন মাধ্যমিকে প্রথম ডিভিশন পেয়ে স্কটিশচার্চে ভর্ত্তি হয়েছিল, অবনীশদা তাকে একটা পেন উপহার দিয়েছিলেন। চকচকে সোনালী ক্যাপের দামি চীনা পেন। বলেছিলেন, তোকে কেউ আটকাতে পারবে না। আর এদিকে ফাঁকতালে আমারও একটু নাম কেনা হয়ে যাবে। লোককে বলতে পারবো—এইসব গল্প কবিতা প্রবন্ধগুলো সুজয় কার দেওয়া পেনে লেখে জানো?'

সেই পেনেই এখনো লেখে সুজয়। না, ভুল হল। লেখে না, কষে। হিসেব কষে। কোম্পানি থেকে ক' প্যাকেট মাল এলো—ক' প্যাকেট বিক্রি হল—মোট কত কমিশন হল—এইসব।

শুধু পেন নয়। অবনীশদার কাছ থেকে আরো অনেক কিছুই পেয়েছে সুজয়। অনেক কিছুই। একদিন অবনীশদার বাড়ীতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে

পড়ে যাচ্ছিল সে। অবনীশদা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন। এও পাওয়া। সামগ্রিক প্রাপ্তিবোধের এক ছোট্ট মডেল। ওই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলা তো শুধু পতন ঠেকাতে নয়, আরো ওপরে তুলে দিতে। সেইখানে, সেই ব্যাপ্ত অনুভবের শিখরে, যেখানে মানুষ এক পরিশীলিত মনের অধিকারী হতে পারে।

তবু সেই হাত ও ব্যাগ দিয়ে মুখকে আড়াল করে।

সুজয়ের পেটের মধ্যে আবার কুলকুল করে ঘুরপাক খায় এক ধুরন্ধর হাসি। মজা, মোটাসোটা লোক কলার খোসায় আছাড় খেলে দেখতে যেমন মজা সেইরকম একটা দুরন্ত পাশবিক মজায় পেয়ে বসেছে তাকে। তার এই চার মাসের নতুন জীবনে, এই বেঁচে থাকার অথবা বেঁচে ওঠার জীবনে—অনেক চেনা লোক দেখেছে সুজয়। দেখেছে চেনা লোকের অনেক অচেনা মুখ। বুঝেছে অচেনা হলেও সেগুলো অনিবার্য। আসলে মানুষের অনেকগুলো লুকনো মুখ থাকে। সেই লুকনো মুখগুলো টেনে বার করে ফেলার এক উদগ্র নেশা পেয়ে বসছে সুজয়কে। তাই মায়ের বারন সে শোনে নি।

মা। সুজয়ের মা। শরৎচন্দ্রের মা নয়। গোর্কীর মা-ও নয়। নিতান্ত সাধারণ। দারিদ্র্যে নাজেহাল হয়ে যাওয়া নিজের কোমল মানষিকতাগুলোকে শুকিয়ে মেরে ফেলা—বদরাগী—খিটখিটে—রুগ্ন এক মা। যে মায়ের চাপে পড়ে আরো ঠিকভাবে বললে, যে মায়ের লাঞ্ছনায় গঞ্জনায়, বেকার বলে অভিমানকরা কথায় সুজয়কে এই হকারির কাজ নিতে হয়; সেই মা-ই একদিন বলেছিল, এখানে কত চেনা লোক। তুই তো ট্রেন লাইনে বা অন্য কোথাও বাসরুটে যেতে পারিস।'

যায়নি সুজয়। কেন যাবে? লজ্জায়? কিসের লজ্জায়? আজ সব কিছু ভেঙে পড়েছে মা। যেখানে বেঁচে থাকার নিদারুণ ইচ্ছেতে মানুষ আঁস্তাকুড়ে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে খাবার খুঁটে খাচ্ছে। গেরস্ত ঘরের সতীলক্ষ্মী মেয়েরা ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে অন্ধকার থেকে আরো নিবিড় অন্ধকারের পথে; সেখানে ধার করে জামাই-ষষ্ঠী পৌষপার্বন কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো করবার ঠাটের সঙ্গে মূল্যবোধগুলোও মেকী হয়ে পড়েছে। তাই লজ্জা আমার নয় মা। লজ্জা তাদের, যারা ভদ্র নিষ্ঠাবান সৎ হয়ে সামাজিকতা রক্ষা করার মহানুভবতায় নিজেদেরকে মিথ্যার বেসাতি বজায় রাখার অঙ্গ করে তুলছে। আমি আমার প্যাকেটের ধূপের আগুন দিয়ে এদের বেনারসি শাড়ীর মতো মধ্যবিত্ত ভণ্ডামিগুলোকে পুড়িয়ে দিতে চাই।

ধূপের আগুন খুব ভা-লো মা। এ আগুন পোড়ায় আর সুগন্ধ ছড়ায়!

না। মাকে এসব কথা বলেনি সুজয়। শুধু বলেছিল, 'নাচতে নেমে ঘোমটা দেওয়ার দরকার নেই মা। হলে তারাই দেবে।' দিয়েছেও তাই। ব্যাগের আড়ালে শুধু অবনীশদা নয়, আরো অনেকের মুখ দেখেছে সুজয়। তাদের প্রত্যেকের চোখ দুটো ঠোঁট কান নাক সব ঠিকঠাক জায়গায় ছিল। শুধু ছিলনা কোন পরিচয়ের গন্ধ। সুজয়ের লোলুপ চোখ দুটো মজা পেয়ে তাদের আরো খুঁটিয়ে দেখে। দেখে আনন্দ পায়। বিষম আনন্দ। নাটক দেখার আনন্দ, অভিনয় দেখার আনন্দ। দেহের ভিতরের রক্তস্রোতের মতো প্রচ্ছন্ন অবিরাম এক নিখুঁত অভিনয় করে চলেছে সবাই। রক্তস্রোত থেমে গেলে জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই এই মেকি স্বার্থসর্বস্ব ভণ্ড মূল্যবোধ আর সংস্কারগুলোকে টিঁকিয়ে রাখতে এদের কি আপ্রাণ অভিনয়ের চেষ্টা। বঙ্গসন্তানকে অভিনয় শিখতে আর স্টানিস্লাভস্কি পড়তে হয়না আপনা থেকেই শিখে যায় তার বাপ মা দাদা দিদি কাকা কাকিমার কাছে। তবু সুজয়ের মতো যারা এই খাপের মধ্যে এঁটে যেতে পারে না-তারাও বাঁচতে চায়।

কারণ শুধু তো কলঙ্ক নয়, চাঁদের মা এই পৃথিবীর নিজস্ব জ্যোৎস্নাও বিপুল। সুজয় চারপাশে তাকায়। ক-ত রকমের কত লোক; সকলের মিলিত শ্রমে সহযোগিতায় গড়াচ্ছে পৃথিবীর চাকা। চলন্ত বাসের থেকে হাত বাড়িয়ে অপরিচিত সহযাত্রীকে তুলে নেয় যে যুবক—বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখে লেডিস সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় যে যুবতী— ধুতি পাঞ্জাবী পড়া বাবুকে থলি থেকে দেশলাই বের করে দেয় যে রিক্সাওয়ালা—তারাও তো সত্যি! এই টুকরো টুকরো সত্যিগুলো তিল তিল করে জমা হয়ে তৈরী করে বেঁচে থাকার বিপুল প্রেরণা।

ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে গেছিল সুজয়। হঠাৎ সামনে দেখে শ্রীমতি।

সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমতি। শ্রী। অনেকদিন বাদে দেখা। প্রায় সাত-আট মাস। সুজয়ের কাছে এটা এত দীর্ঘ সময়—যেন অতীত জীবন। মুখের চামড়া আরো মসৃণ হয়েছে শ্রীর। শাড়ীটা নতুন না হলেও আগে দেখেনি সুজয়। তাহলেও শ্রী পাল্টায় নি।

এখনো একই আছে ঠিক আগের মতো।

শ্রী দ্যাখে। ভ্রু কুঁচকে দ্যাখে। মাত্র কটা মাস, এর মধ্যেই এইরকম। উস্‌কোখুস্‌কো চুল, অযত্নে বেড়ে ওঠা গালভর্তি দাড়ি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ এ

কোন সুজয়! হয়তো সামান্য তবু মনে হল, অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলছে না। অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠে শ্রী।

বাঃ একেবারে আঁতেল হয়ে গেছ দেখছি!

আঁতেল? মানে ইণ্টেলেকচুয়াল? হা হা হেসে ফেলে সুজয়।

ঠিক বলেছ। ঝোলায় কি আছে জানো? ম্যানাস্ক্রীপ্ট।

কই দেখি?

না থাক।

সিগারেটের টুকরোটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় সুজয়। শ্রীর নিটোল মুখ অনেক কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। অ-নেক স্বপ্নের প্রতিজ্ঞার, কল্পনার কথা। কিন্তু ভাবতে বড় আলিস্যি লাগে সুজয়ের। কী হবে ভেবে। জীবনের মাঝে মাঝে অনেকগুলো মাইলস্টোন থাকে। চার মাস আগে তার একটাকে পেরিয়ে এসেছে সুজয়। পেছনে ফেরা বৃথা।

কোথায় গেছিলে?

মুনমুনের বাড়ী।

কে মুনমুন?

মুনমুন। মুনমুন ব্যানার্জী। বাঃ মনে নেই। সে-ই যে যার জন্মদিনে তুমি 'এবার ফিরাও মোরে' আবৃত্তি করেছিলে।

মনে নেই। কাউকে মনে নেই। আমি সবাইকে ভুলে গেছি শ্রী।

শ্রী অবাক চোখে তাকায়। একটু থেমে বলে, আমাকেও?

হয়তো।

আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করে সুজয়।

ও।

মুখ নামিয়ে নেয় শ্রী। আঁচলের প্রান্ত নিজের আঙুলে জড়ায়। সুজয় দ্যাখে। কি বলবে ভেবে পায় না। দাড়ি চুলকোয়। বলে, আমি অনেক বদলে গেছি শ্রী। ক্রোধ ছাড়া আমার মনে আর কোন অনুভূতি জাগে না। সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান সব কিছু মরে গেছে। আমার গলার স্বরে বুঝতে পারছো না? শুনলে কি মনে হয়—এই গলা একদিন বনলতা সেন আবৃত্তি করত? দিনরাত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমি আমার সব কিছুকে নষ্ট করে দিয়েছি শ্রী।

চেঁচিয়ে মানে! কি করো তুমি?

নিজেকে সামলে নেয় সুজয়। ঠোঁট কামড়ায়। হাসে। বলে, শ্লোগান। শ্লোগান দিতে হয় তো।

শ্লোগান? রাজনীতি করো নাকি?

করে না কে? রাজনীতির সঙ্গে সবাই জড়িত প্রত্যক্ষে অথবা পরক্ষে।

তা তুমি প্রত্যক্ষে কবে থেকে? শ্রীর স্বরে ব্যঙ্গ।

চার মাস। তবে এর প্রস্তুতি অনেকদিন। সেই যেদিন বাবা মারা গেল।

শ্রী চুপ করে থাকে। মাথা নামিয়ে নেয়।

মনে আছে শ্রী। যখন অফিসে আমার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা যাচ্ছে, আমরা তখন কফিহাউসে বসেছিলাম।

মনে আছে। তুমি আমাকে 'প্রিয়তমাসু' শুনিয়েছিলে। সেই আমাদের শেষ দেখা। মুখ তুলে তাকায় শ্রী।

বিশ্বাস করো সুজয়। আমি তোমাকে অনেক খোঁজ করেছিলাম। এমনকি তোমার বাড়ীতেও কয়েকবার গেছি। তবু তোমায় পাই নি। হাসে সুজয়। এক উদার হাসি।

সেই আমাকে আর কখনো পাবে না শ্রী। এই এখনো পাচ্ছো না।

মানে?

এটা অন্য সুজয়। এর সঙ্গে তুমি চলতে পারবে না

কেন পারবো না?

পারবে না।

পারবোও।

বেশ চলো।

সুজয় হাঁটতে থাকে।

অ্যাই কোথায় যাচ্ছো?

তুমি বাড়ী যাবে তো? আমিও শ্যামবাজারে নামবো চলো।

একটা ডবল ডেকার এসে দাঁড়ায়। দুজনে এগোয়। শ্রী জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে দেখা হবে? চোয়াল শক্ত হয়ে যায় সুজয়ের। লোভাতুর হয়ে ওঠে। বলে, আগে শ্যামবাজার অবধি যেতে পারি কিনা দেখি, তারপর তো?

শ্রীর হাত ধরে সে পিছনের গেটে নিয়ে যায়।

ওমা! এখানে কেন একতলায় চলো।

ওঠোই না। দরকার আছে।

দুজনে দোতলায় ওঠে। শ্রীকে ফেলে এগিয়ে যায় সুজয়। সকলের আগে, একদম বাসের সামনে। তারপর ঘুরে দাঁড়ায় সে সবার মুখোমুখি। প্রথমে চোখ রাখে শ্রীর দুটো বিস্মিত চোখের ওপর।

শ্যামবাজারের বাস থেকে নামে সুজয় একা। অনিবার্যভাবে একা। প্রচণ্ড হাসির দমক তার বুক থেকে ঠেলে উঠছে। প্রাণান্তকর চেষ্টায় সেটা চেপে রাখে সে।

শ্রী কখন নেমে গেছে সুজয় দেখে নি। দেখতে পায় নি। তখন সে বিক্রীতে ব্যস্ত ছিল। এই ট্রিপে প্রচুর বিক্রী হয়েছে। সুজয়ের ঝোলা এখন একদম খালি।

* *
*

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা বাস করে। মাত্র বিশ শতাংশ মানুষ বাস করে বিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে। দশ বছর আগে তৃতীয় বিশ্ব পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ১১·৫ শতাংশ উৎপাদন করতো। ৬০ শতাংশ বিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলি, তাদের জনসংখ্যা ৬৫ কোটি। তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা ১৫৫ কোটি। দশ বছরে হিসেবের খুব একটা হেরফের হয়নি। তবে বিকাশমান দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেবার পরিমাণ কমেছে। এখন সর্তের সংখ্যা বাড়ছে। দরিদ্র দেশগুলির রপ্তানি পণ্যের উপরে কর বাড়ছে। লক্ষ্য, হয় আমাদের জোয়ালের তলায় এসো নয় শুকিয়ে মরো। শাঁখের করাত। জোয়ালের তলায় গেলেও দারিদ্র, না গেলেও। তবে জোয়াল কাঁধে বলদের ডুবে মরা সোজা। অন্তরা একটু হাত পা ছুঁড়তে পারে।

অনেকটা 'কিনু গোয়ালার গলি' এর মত

স্বর্ণেন্দু সেন

এক

দিন কাটে। আমার ঘরের পুবের জানালাটা খোলা; সব সময়েই খোলা থাকে। যখন কোন কাজ থাকেনা, বেতের মোড়া নিয়ে বসি ওটার পাশে। পাশের জমিতে বাড়ি হবে—পিলার বসানো হচ্ছে। তাই দেখি। যখন এক-ঘেঁয়েমি আসে তখন তিন পা ওয়ালা, ইঁট ঠেকানো চৌকিতে শুয়ে চলটা ওঠা ছাতের কড়ি বরগা গুনি।

কিছুদিন হলো ট্রানজিস্টারের ব্যাটারিটা ফুরিয়ে গেছে। কেনা হয়নি—তাই ট্রানজিস্টরটা বন্ধ। ঘরটা গুমোট। বিদ্যুৎ মন্ত্রীর ব্যর্থতা সচল রাখেনি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড পাখাটাকে। গরমটা অসহ্য।

বারান্দায় আমি—এদিক ওদিক দেখি—যদি কোন কুমারীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে। কিন্তু কুমারীর বাজারে ব্ল্যাক আউট। কাউকে না পেয়ে ঘরে এসে আয়নায় নিজেকে দেখি।

বছর খানেক হ'ল আয়নাটা কিনেছি। সস্তাতেই—তাই হয়তো মুখটা লম্বা দেখায়। যাইহোক—দেখতে আমাকে মন্দ নয়। তিনবছর বেকারত্বের কুলিগিরি করে, রোদে ঘুরে বাবার দেওয়া রংটা খুইয়েছি। তাও—মুখটা ভালোই। এঃ—দাড়ি হয়েছে খোঁচা খোঁচা—কালই ভরতের হেয়ার কাটিং এ যেতে হবে।

মাঝে মাঝে মনটা ভালো হয়। আমার আর পাশের যে বাড়িটা হচ্ছে তার মাঝে আছে একটা শিরীষ গাছ। হাওয়াতে শিরীষের ফুল আর পাতা ভরিয়ে দেয় আমার ছোট্ট বারান্দা। তটিনী আসে। আমার মনের এক ঘেঁয়েমি স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে তটিনী আসে। মনটা ভালো হয়। পুবের জানালা দিয়ে সোনালী এক টুকরো রোদের সাথে আসে একটু হাওয়া। গুমোটটা কাটে।

দুই

বছর ঘোরে। পাশের বাড়িটা তৈরী হয়ে গেছে। শুনেছি বড় ব্যবসা দারের বাড়ি। আমার ঘরের পাশাপাশি থাকে প্রায় আমার বয়সী একটা

ছেলে। ওর ঘরের পশ্চিম দিকে আছে বড় জানালা। সেটা থাকে খোলা। তাই দিয়ে আমার দৃষ্টি পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে যায়। মোজাইক করা মেঝের কিছুটা চোখে পড়ে।

রাতে ট্রান্সফরমার বিকল হ'লে বা বয়লার ফেটে গেলে ওর ঘরে জ্বলে এমারজেন্সি। আমার কেরোসিনের খরচ বাড়ে। ও ওর জানালার পর্দাটা দেয় তুলে—আমার নেই আব্রুর বালাই। ওর ঘরে দিনরাত ইংরিজি সুর বাজে।

ওর মনের খবর রাখিনা। তবে আজকাল চোখে চোখ পড়লে মনে হয় ও একটু হাসে। আমিও অগত্যা ভদ্রতার খাতিরে···কিন্তু ওর হাসি দেখে মনে হয় ও আছে মজায়।

হিংসে নয়। আমি আমাকে নিয়ে সুখী। অপরের মজার ভাগীদার হতে চাইনে। তবু আজকাল দুঃখ হয়।

তিন

ওর পশ্চিমা জানালার পাশে আমার খোলা জানালাটা ম্যাড়ম্যাড়ে লাগে। আমার জানালাটা ক্রমশঃ ক্ষীণজীবী হয়ে আসছে। ছিটকিনিগুলো গেছে ভেঙে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায়। সংগ্রাম করে সব সময় অটল থাকতে পারেনা পাল্লাটা। যোগ্যতার লড়াইতে পরাজিতের খাতায় ওর নাম উঠতে চলেছে। আমারই তো জানালা।

কিন্তু সেজন্য দুঃখ হয় না। ক্ষয় ও পতন তো বস্তুর সাধারণত্বের প্রতীক। তবু আমি দুঃখ পাই। কেন?

আজকাল আর আমার বারান্দাতে ঝাটা বুলোলে শিরীষ পাতা জড়ো হয় না বরং ওদের বাড়ির ব্যালকনিতে পাতা থাকে সবুজ কার্পেট। ও বাড়ির ঝি পাতাগুলোকে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে; কিন্তু আমি ওদের চাই। তবু ওরা আসেনা আমার কাছে। বরং পাশের ব্যালকনি থেকে উপভোগ করে আমার বিরহের জ্বালা। ওরা প্রাচুর্যকে দেয় প্রেম, নিঃস্ব কে দেয় অভিমান আর বেদনা। বড় দাগা দেয় ওরা।

কিন্তু এরকম কোন দিন ছিলনা। নিঃস্বকে সঙ্গ দানেই ওদের আনন্দ ছিল। তাই একটু অস্বাভাবিক লাগে। তটিনীর ঐ হঠাৎ আগমনী পরিবর্তনই আমার মর্মপীড়ার কারণ। আমি থাকি আজকাল একাকীত্বের গভীরে, গোপন

অন্ধকারে। নির্বাসনে থেকে অবসর সময়ে মনে পড়ে সেই সূর্যমুখী দিন গুলোর কথা আর দুঃখ পাই।

তবুও আমি ভাবি যে আমার পূবের জানালা দিয়ে আসে উদীয়মান সূর্যের আলো। ঘরটা ভরিয়ে দেয় রক্তিমতায়। রক্তের লাল আমেজ ছড়িয়ে পড়ে ঘরের প্রতিটি কোণে। সৃষ্টিতে অনাদি কালের বাণী বহন করে নিয়ে আসে ঐ আলো। কিন্তু ওদের পশ্চিমের জালনা দিয়ে আসে অস্তের আমেজ। তাতে আছে চাঞ্চল্য ও চটক, কিন্তু তা চর্মসার, অন্তঃসার শূন্য।

এসব ভাবি আর সান্ত্বনা পাই। তবুও মনের মধ্যে তটিনীর প্রবাহ পরিবর্তন প্রসঙ্গে থেকে যায় শ্লেষ। মাথাটা ঝিমঝিম করে। ভাবি বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব। কিন্তু সেই সব সরস নীরসতাযুক্ত তত্ত্ব মনটাকে ব্যাগে আনতে পারেনা। লোক সমাজের মধ্যেই আমার হয় দ্বীপান্তর। চতুর্দিকে দেখি তরঙ্গের দোলা। চেষ্টা করি কঠোর হতে, মনের গভীরে নেওয়া বাস্তবের পেরেক ঠুকতে।

কিন্তু, তবু আমি হই ব্যর্থ। কঠোর দেয়ালে লেগে পেরেক প্রতিফলিত হয়। গভীর আঁধারে বসে মনের মানস পটে আঁকা হয় রঙীন স্বপ্নের জাল। মনটা বয়ে যায় অনন্তের দিকে এক টুকরো আশা নিয়ে।···যদি কোন দিন তার দিন ফেরে—তার আঙ্গিনাটা আবার ভেসে যায় শিরীষের বণ্যায়·····

ফিরে দেখা

মৌসুমী সিংহ

সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে আসছে। প্রবীর অচেনা গ্রামের পথে আর বেড়াতে সাহস না করে পিসীমার বাড়ী ফিরে আসে। কিন্তু বাইরের দাওয়ায় পা দিয়েই চমকে ওঠে সে—আরে! সেদিনের দেখা মেয়েটা না! রোগা, ময়লা রং, পরনে আধময়লা শাড়ী, হাতে কাঁচের ক'টা চুড়ি, শুকনো মুখ! সঙ্গে ও'র মা-ও আছে! ব্যাপার কি?

ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল রাত্রে খাওয়ার সময়ে। পিসিমা কাতরকণ্ঠে বললেন "আমার এই কথাটা তুই রাখ্ বাবা, এই কাজটা তোকে করতেই হবে—গরীবের

মেয়ে—কিছু দেবার সাধ্য নেই, কিন্তু বড় ভাল মেয়ে। আমি বলছি তোর বাড়ির সবাইকে ও সুখী করতে পারবে।" প্রবীর ঝাঁঝিয়ে ওঠে—"না! না! না! বলছি তো আমার পক্ষে এ সম্ভব নয়। একে আমার পড়াশুনা শেষ হয়নি —তার ওপর কোথাকার না কোথাকার একটা কালো মেয়ে, পড়াশুনো জানে না—"

"কিন্তু বাবা, সন্ধ্যার ঐ বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই রে—"

"তার আমি কি করব! রাজ্যের অরক্ষণীয়াদের উদ্ধারের ভার ভগবান আমার ওপর দিয়েছেন? লক্ষ লক্ষ মেয়ের তো আজ এই অবস্থা—সকলেই স্ট্রাগল করছে বাঁচার জন্য—ও-ও করুক।"

দরজার আড়াল থেকে একটি অস্পষ্ট ছায়া মূর্ত্তি যেন নীরবে সরে গেল।

বছর পনেরো পরের কথা। সেদিন প্রবীর যাচ্ছিল পুরী থেকে কোণারকের পথে বেড়াতে। ভুবেনেশ্বরে এসেছিল অফিসের কাজে। কয়েকদিন ছুটি নিয়ে পুরী হয়ে কোণারক ঘুরে যাবার ইচ্ছা।

বাস ছুটে চলেছে হু হু বেগে। দু'ধারে বিদ্যুতের মতো পিছনে সরে যাচ্ছে মাঠ গাছপালা, ছোট ছোট মাটির বাড়ি। বেশ লাগছে তাকিয়ে থাকতে। শীতের শেষ-ছোঁওয়া-মাখা হাওয়াটা বড় মিষ্টি। প্রবীর মাফলারটা সুটকেস থেকে বের করার জন্য ভেতর দিকে মুখ ফেরায়। মাথাটা নীচু করে ব্যাগটা টেনে তুলতে যাচ্ছে, সহসা কানে এল, "এক্সকিউজ মী! কটা বেজেছে কাইণ্ডলি একটু বলবেন—ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে···"প্রবীর চমকে মুখ তোলে, চোখ আটকে যায় শ্যামলা মিষ্টি মুখটিতে,পরণে তার হালকা সবুজ শাড়ি কাঁধে একটা কিটব্যাগ। এক ঝলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রবীর বলে, "প্রায় সাড়ে এগারোটা।" তারপর মাফলারটা গলায় জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞাসা করে, "কোণারক যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। আপনিও তো—" প্রবীর একটু হেসে বলে, "তবে কি জানেন? আমার আবার পথের প্রান্ত থেকে পথের দু'ধারই বেশী ভাল লাগে। এই দু'ধারে অজস্র সবুজের মেলা খোলা ঠাণ্ডা হাওয়া, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন মানসিকতা নূতনের দিকে অবাধ উদ্দাম গতি, সব মিলিয়ে unique।" মেয়েটি একটু হেসে বলে, "যা বলেছেন। তবে কি জানেন, এসব কথা বলা বা শোনার লোক বড় কম। আপনি সিনেমার কথা বলুন, সবাই বড় বড় চোখে শুনবে,আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষের মনে বিচিত্র অনুভূতির উন্মেষের কথায় তারা হাই তোলে।"

"যা' প্রকৃত সুন্দর—তার উপাসক চিরকালই কম। তা' বলে তার মূল্য তো

কমে না। কিন্তু সে কথা থাক, আপনার মত সহযাত্রিনী পাওয়াটা কিন্তু উপরি লাভ—এটা তো স্বীকার করেন যে সংবেদনশীল বন্ধুর সান্নিধ্য চলার পথের আনন্দ অনেক বাড়িয়ে দেয়।"

মেয়েটি নীরবে মৃদু হাসে। শরতের প্রথম সোনালী রোদের মতো নরম, স্নিগ্ধ হাসি। প্রবীরের মনে হল শ্যামলা রঙের মেয়েটির হাসিটি বড় মিষ্টি; চোখের তারায় শান্ত বুদ্ধির দীপ্তি। একটা মৃদু ভাল লাগার আমেজে ছেয়ে যায় ও'র মন·····টুকরো টুকরো কথায় জমে ওঠে আলাপ। সাহিত্যের কথা··· গানের কথা ·····জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা·····। প্রবীরের মনে হয় যেন ওর সাথে তার বহুদিনের পরিচয়। কালস্রোত বেয়ে জানা অজানা, আনন্দ-বেদনার আলো-আঁধারি-মাখা ছায়পথ পেরিয়ে তাদের কতকালের যুগলযাত্রা। প্রবীরের মনে হল ও বলে তাকে, "কেন তুমি আসনি এতকাল আমার জীবনে···!"

বাস এসে পৌছায় কোণারকে। সকলের মধ্যে থেকেও সকলের দৃষ্টির আড়ালে মেতে ওঠে ওরা দুজনে মেতে ওঠে আনন্দ ভরা এক নবচেতনার জীবনের এক বন্ধ দুয়ার খুলে যায় ওদের সামনে। মেয়েটি নিভৃতে আবৃত্তি করে রবীন্দ্র-কবিতা—প্রবীর তার মুগ্ধ শ্রোতা। কবিতা শেষ হয়ে যায়···শেষ হয়ে যায় মৃদু আলাপন···সন্ধ্যা ঘন হয়ে নেমে আসছে···একটু দূরে শোনা গেল বাসের হর্ণের তীব্র আওয়াজ। ওরা হাঁটতে থাকে সেদিকে। পায়ের তলায় ভেজা ঘাসের মৃদু শীতল পরশ···মাথার ওপর দু'একটি তারা উঠেছে ফুটে অনন্ত আকাশের কোলে। প্রবীর সহসা ক্ষণিকের এই অজানা বন্ধুর হাত চেপে ধরে বলে ওঠে, "তোমার এ দান আমার জীবনের সম্পদ হয়ে রইল···এর প্রতিদান তোমাকে কোনদিন···" কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার। মেয়েটি বাধা দিল না— স্মিতহাস্যে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিল হাত। প্রবীর অবাক হয়ে অনুভব করলো এই স্বল্পবাক মেয়েটির মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্য দূরত্ব, এক অপূর্ব সংযত ঔদাসীন্য। তার এই হাত সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে নেই রূঢ় প্রত্যাখ্যান, আছে দার্ঢ্যপূর্ণ আত্মসম্ভ্রম।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের দিকে চলেছে··· পুরী প্রায় এসে গেল··· আর একটু পথ। সহসা মেয়েটি বাসের আধো-আঁধারে প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার নামটাই কিন্তু এত কথার মধ্যে জানা হল না—।"

"প্রবীর···প্রবীর মিত্র।"

"প্র-বী-র-মি-ত্র", মনে হল মেয়েটি অন্ধকারে একটা কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছে—

"আচ্ছা মাপ করবেন, মৌরীগ্রামে কি আপনি বছর পনেরো আগে একবার গিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ, ওখানে তো আমার পিসিমার বাড়ী···কিন্তু আপনি কি করে···" প্রবীর অবাক গলায় বলে। একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি বলে, "আমি ঐ গ্রামেরই মেয়ে।" অন্ধকারে তার মুখটা ভাল দেখা গেল না, কিন্তু গলাটা যেন অন্যরকম ঠেকল। প্রবীর ব্যগ্র গলায় বলে, "আরে, তাই নাকি ? সেটা তো বলতে হয় আগে—আপনার নাম ?" মেয়েটি যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে বলে, "আপনি বিয়ে করেননি ?" এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু-চমকে ওঠে প্রবীর। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে ; "হ্যাঁ,···তবে Now we are separated···। সে যাই হোক, আপনার নামটা কিন্তু···" সহসা মেয়েটি বলে, "ঐ দেখুন, এসে গেল পুরী। নিন্, নিন্, ব্যাগটা গুছিয়ে নিন্···।"

"নিচ্ছি, আপনার পরিচয় কিন্তু বলছেন না—"

পুরী এসে গেছে। বাস এসে থামল মোড়ের মাথায়। মেয়েটি কালবিলম্ব না করে কিটব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়। সহসা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে প্রবীর দু'হাতে মেয়েটির হাত ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলে,"কিন্তু আপনার নামটা আপনি বলছেন না কেন ?"

কালো মেয়েটি সন্ধ্যার আঁধারে অল্প একটু ঘাড় ফিরিয়ে প্রবীরকে একঝলক্ দেখে বলে, "সত্যিই চিনতে পারছেন না ?"

"না তো'—কে আপনি··· কখনো তো···?"

"আমার নাম সন্ধ্যা। বাবা মারা যাবার পর দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন আমার মা আর···আমি-ও আপনাকে বেশ বিরক্ত করেছিলাম। আজ এই সন্ধ্যায় আপনাকে কিছু আনন্দ দিয়ে তার প্রতিদান দিতে চেষ্টা করে গেলাম। শুনে সুখী হবেন, আপনার সেই জীবন সংগ্রামের উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। মা'র মৃত্যুর পর গ্রামের বৃদ্ধ কাদারের দয়ায় তাঁর কাছে সস্নেহ আশ্রয় পেয়েছি—আমার মত এক হতভাগিনীকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তিনি মানুষ করে তুলেছিলেন যার জন্যে আজ আমি মফস্বলের এক বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপিকা। যা হোক্, এই কালো, মূর্খ, গেঁয়ো মেয়ের সাথে দিনটা মন্দ কাটল না—কি বলেন ? কিন্তু আর না, অনেক রাত হয়ে গেছে—আচ্ছা, চলি নমস্কার।"

সন্ধ্যার গাঢ় আঁধারে ক্ষিপ্রপদে সন্ধ্যা দূরে মিলিয়ে গেল।

চোখ

অভিজিৎ চক্রবর্তী

—ও ! নকুলবাবু শেষে সেই হেড মিষ্ট্রেসকেই বিয়ে করলেন !

—না না আপনি বসুন।

—আচ্ছা দেবব্রতবাবুর খোঁজ রাখো ?

—অসভ্য ! মেয়েদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানেন না !

দুর মশাই ! ডি. এ হ'ল গিয়ে একুনে দু'শো সাতাত্তর টাকা তেরাশী পয়সা।

—সিজার, নটি বয় ! বাইরে ঝুকছো কেন ?

গরম, ঘাম, কাটা কাটা সংলাপ—ঘন ঘন গীয়ার চেঞ্জের ধাক্কা সামলে ছুটতে থাকা বাসের যান্ত্রিক সরব প্রতিবাদ—ভেসে যাচ্ছিলাম আমি। কথার স্রোতে কুলকুল ঘামের ফল্গু ধারায়। জানিনা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। এর তার হাত-পা-মাথায় যেন জট পাকিয়ে গেছে ! ঐ যে বলে,—

—"ভীড় এক অখণ্ড সত্তা", ঠিক তাই। অফিস টাইমের বাসগুলোতে উঠলে এই ব্যাপারটা বেশ বোঝা যায়। যাই হোক চোখ-কান কিন্তু খুলেই রেখেছিলাম। দেখতে দেখতেই, অনেকের ঘাড়-মাথা-নাক-কানের ফাঁক দিয়ে একজনের একজোড়া চোখ আর ঈষৎ টিকালো নাকের কিছুটা নজরে এল। ঠিক যেন অসম, খাঁজকাটা ক্যানভাসে আঁকা একটা মডার্ণ আর্টের ছবি,···শুধু দু'টো চোখ আর নাকের অংশবিশেষ। বেশ লাগছিলো দেখতে। তাকিয়েই ছিলাম ; একটা নূতন আবিষ্কারের বস্তুকে যেভাবে দেখে তার আবিষ্কারক, ঠিক সেই ভাবে, এবং বুঝেও ফেললাম কিছুক্ষণেই (পাঠিকারা দোষ নেবেন না আমার) ঐ সূক্ষ্মকোণে চোখের তারা ঘুরিয়ে কোনো পুরুষ তাকায় না, আমার বিশ্বাস আমাকেই দেখছিলো সে। ···ঘুরে ফিরে যত বারই তাকাই চোখাচোখি হতে লাগলো।

মানুষটা আমি নেহাৎই নিরীহ গোছের হলেও, "কাঠগোট্টা"— এ অপবাদ কেউই দেয়নি এযাবৎ, সুতরাং চোখ ফেরানো কষ্টকর হলো। চোখে চোখ রেখেই মোটামুটি একটা "তরুণী অষ্টাদশী গৌরাঙ্গী" রূপ কল্পনা করতে আমার সময় লাগলো না বেশী। তাকালেই কেমন বুক দুর্ দুর্ দুর্ করছিলো। কিন্তু

চোখই বা ফেরাই কি করে? একুশটা কোকিলের কুহুতানে কান ঝালাপালা, আবার ভাবলাম—

অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে! রেগে যায়নি তো! ভীড় ফাঁকা হলেই হয়তো একরাশ ইংরাজ গালিতে আমার পেডিগ্রী ভুল প্রমাণ করে ছাড়বে।

ভয়ে ভয়ে চোখ ফেরালাম। কিন্তু অবুঝ একুশ বছর। কিছুক্ষণ বাদেই দেখলাম—

নিজের জায়গা থেকে এক পাও সরিনি। সরতে পারতাম—তবুও। "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব" এইরকম একটা মনোভাব নিয়ে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দু-একটা সরস মন্তব্য (বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেই) শুনেও শুনলাম না। কারণ, আমার অন্যদিকে তাকানোর আর উপায় ছিল না। সেই অপলক দৃষ্টি আমার ভীড়, ঘাম, কাটা সংলাপ বাসের যান্ত্রিক আক্ষেপ থেকে অনেক ওপরে তুলে দিয়েছিলো।···সেই চোখে—আমি যেন আস্তে আস্তে মুখ্যতা, ভালোবাসা কৌতূহল আর অনুরাগ খুঁজে পেলাম।

আশ্চর্য! পলকহীন চোখে ও কি শুধু আমাকেই দেখেছে!···আমি অস্থির হ'লাম, ভাবলাম, মানে কামনা করলাম,

ওর যেন আমাকে প্রয়োজন হয়। কত কিই তো ঘটে! বাসভাড়া ফুরিয়ে যায়, জুতোর হীল খুলে যায়—চুলের ক্লীপ হারিয়ে যায়—নিদেন পক্ষে ছোটখাটো একটা এ্যাকসিডেন্ট অথবা কোনো বখাটে ছোঁড়ার (স্বাস্থ্যহীন হ'লেই ভাল হয়) আবির্ভাব!

ঘাস কিচ্ছু হ'লো না বরং ডালহাউসী এসে গেলো। হুদ্দাড় করে লোক নামতে শুরু করলো। আমার সেই ক্যানভাসটাও হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পাগলের মতো এগোতে লাগলাম আমি। মেয়েটাকে দেখতেই হবে। কে যেন আমার পা মাড়িয়ে দিলো; কার মাথায় আমার মাথা ঠুকে গেল। আমল না দিয়ে শুধু সামনের লোককে ঠেলতে লাগলাম।

হা ক্যানভাস সুন্দরী! হে পঞ্চতীরের তীরন্দাজ! এই কি পরিহাসের সময়! চূড়ান্ত "ক্লাইম্যাক্সে" কাপড়ের খুঁট আর কোলাপুরী চপ্পলের চপল কোলাকুলিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। আমার গা'য়ে লেগে কার হাতের লাঠি ছিটকে পড়লো।

আহা-হা! ইস্-স ধ্বনির সাথেই চাপা হাসি টগবগিয়ে উঠলো সারা বাসটায়। লজ্জা—কাছা ও কোঁচা সামলে উঠতে, সময় নিল একটু। বাস ততক্ষণ বেশ ফাঁকা। অফিস যাত্রিরা সব নেমে পড়েছে, দাঁড়িয়ে থাকা একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রৌঢ়া হতভম্বের মতো হাত নেড়ে বিড়্ বিড়্ করছিলেন। -My stick !...er...Mister, help me ,...

লাঠিটা কুড়িয়ে ভদ্রমহিলার হাতে তুলে দিলাম, ওনার টিকালো নাক, স্থির অপলক চোখে চোখ রেখে সাত-পাঁচ ভাবছিলাম। কে একজন কানের কাছে বলে উঠলো,

—দেখছেন কি ম'শয়! পাথরের চোখ।

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উগ্র আধুনিকতা

গৌরীশঙ্কর দাশ

বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গতি প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে আজ অনেকের মনেই একটা বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। রুচির বিকৃতি আর রসের বৈকল্য বোধেই এমন বিরূপ ভাবের প্রকাশ।

বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পরবর্তী কাল থেকে বিদগ্ধ মনের একটি নিটোল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সমাজ গড়ে উঠেছিল। সেকালে কানু ছাড়া গীত ছিলনা। বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কানু-পীড়িতি যে ভাবাবেগের আবেষ্টনী গড়ে তুলেছিল সেখানে আবেগের উচ্ছলতা থাকলেও উগ্রতা ছিল না। বিলাস কলার কুতুহল থাকলেও উদগ্র বাসনার প্রকাশ কল্পনায় কদর্যতা ছিলনা। স্নিগ্ধ ভাবের প্রেমার্তি অন্তরকে আবিষ্ট করলেও আবিল করে তোলেনি। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য "কানুর পীড়িতি চন্দনের রীতি ঘসিলে সৌরভময়" হয়ে চতুর্দিক চন্দনের শুচিস্নিগ্ধ গন্ধে ও আবেশে হৃদয়কে নন্দিত করে তুলে একটি সাংস্কৃতিক কুঞ্জ রচনা করে তুলেছিল এবং তার সুদূর প্রসারী প্রভাব দীর্ঘকাল ধরেই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক চেতনাকে নানা রসে রূপে ও ভাবে বিকশিত করে তুলেছে। আর তার ঢেউ একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর তটে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে। তার পরের কালটি হঠাৎ বৈদগ্ধ্যের পথ ছেড়ে বিগর্হিত পথে বেঁকে গিয়েছে। বিদগ্ধ রুচি বিগর্হিত রুচিতে পরিণত হয়ে গেছে। সে যুগ টপ্পা খেউর আর হাফ আখড়াই কবিয়ালের যুগ। বাগান বাড়ির বিলাসকুঞ্জে বাইজি নাচনের বিকৃত রুচি শুধু ব্যক্তি জীবনকে ভোগ আবিলতার পঙ্ক কুণ্ডে টেনে আনেনি, সে বিগর্হিত রুচি আর কুরসিক রস রঙ্গতা সমাজ জীবনকেও কলুষিত করে তুলেছিল। যার পরিচয়ে তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। কবি মধুসূদনকে ব্যথিতচিত্তে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—"কুরসিক নাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে-বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

তার পরের যুগ বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে এনেছিল নতুন ভাবাবেগের জোয়ার, নতুন জীবনের জয়োল্লাস। সেযুগ উনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনারযুগ। কি সাহিত্য-সংস্কৃতি, কি সামাজিক জীবনচর্যা সমস্ত দিককে ঘিরে জীবনের একটি নতুন মূল্যায়ন ঘটলো সে যুগে। সংস্কৃতির উদার অঙ্গনে

বাঙালীর জীবনচর্যা ও চর্চা রুচির রূপ রস ভাব ও রুচির উচ্চ গ্রামে সুস্থিতি লাভ করল এবং বঙ্গ সংস্কৃতির সে রসধারা শুধুমাত্র বাংলার লোক-জীবনকেই বিপ্লুত করেনি, সে সংস্কৃতির ধারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনকে প্লাবিত করেছিল। রবীন্দ্রগীত রসধারার সিঞ্চনে আর কাব্যনাট্যের নব নব প্রেরণায় ওরসবৈচিত্রের বিপুল বৈভবে বঙ্গসংস্কৃতির ভাণ্ডার ভরে উঠল। প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রসন্ন অভিব্যক্তিতে বঙ্গ সংস্কৃতির উদার প্রাঙ্গনে বৃহৎ জীবনের উদাত্ত আহ্বান ব্যক্তি জীবনোপলব্ধি বিশ্বাত্মিক আনন্দোপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করল। বঙ্গসংস্কৃতি প্রাণ প্রাচুর্যের রসস্ফূর্তিতে জীবনচর্যার শান্তি-নিকেতনের রূপ পরিগ্রহ করল।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সামগ্রিকভাবে চরিত্রহননের যে বিধ্বংসী লীলা বহ্নিস্ফুলিঙ্গের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো,তার ছোঁয়াচ বাঙ্গালীর রসবিদগ্ধ শান্ত শুচি স্নিগ্ধ সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রথমেই দগ্ধ করে দিয়ে গেল। আর সেই দগ্ধীভূত মসীলিপ্ত কালিমা কলুষিত জীবনের নগ্নরূপ ভীষণভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ল স্বাধীনোত্তর ভারতের বিখণ্ড ছিন্ন বিভক্ত বাঙ্গালীর সমাজ জীবনে।

সংস্কৃতি বলতে জীবন পরিচর্যার সুসংবদ্ধ রস-রূপায়ন বৈ তো নয়। আর সে রস রূপের স্ফূর্তি ঘটে রুচির মধ্যে দিয়ে। বিস্ফারিত হয় সাহিত্য, নাটক ও শিল্পের মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর বর্তমান জীবনের যে ভাবমূর্তি তা রসাবিষ্ট নয়, আবেগ উচ্ছ্বসিতও নয়। সে জীবন দৃষ্টিতে স্বপ্নের বিলাস নেই। সে জীবন জিজ্ঞাসায় কোন অলৌকিক মায়া নেই, আত্মোত্তীর্ণ ভাবচেতনাও নেই। সে জীবনের প্রজন্ম বিজ্ঞানের বীক্ষণাগারে। স্থূল দেহচেতনায় সে জীবনের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত। মনের মায়ালোকে অথবা অন্তরের অন্তস্তলে সে জীবন-চেতনার গতায়াত নেই। তাই বিমূর্ত জীবন চাইল মূর্ত হতে। "চক্ষে যাহা দেখিবার নহে, চক্ষে তাহা দেখিবারে চাহে।" বিত্তবৃত্তির ভারক্লপকে দেহসর্বস্ব ভোগ বাসনার জৈব চরিতার্থতায় পেতে চায়। অখণ্ড জীবনের সর্বব্যাপ্ত রূপে খণ্ডিত জীবন-দৃষ্টিতে ধরে রাখা যায় না। খণ্ড বিচ্ছিন্ন উৎপাটিত-মূল বাঙ্গালীর জীবন-দৃষ্টিতে তার অতীত রূপ বিকৃত হয়ে ধরা দিল। সমাজ-জীবনের এক বিরাট হাহাকার আর হতাশায় দিন যাপনের আর প্রাণ ধারণের ক্লেদময় গ্লানি জীবনকে পাকে পাকে পঙ্ককুণ্ডের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিমজ্জিত করে দিতে চাইল। মহৎ আদর্শের ভাবাত্মিক জীবন অসহায়তার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আজীবন ঘৃণাভরে তুচ্ছ করা পাশবিকতার করুণাজীবীতে পরিণতি লাভ করল। অন্নময় জীবন শুধু দেহ ভোগের স্থূল ভোগচেতনার আবিলরতার পঙ্ককুণ্ড আশ্রয়

করল। বৃহৎ জীবন নিয়ে বাঁচার বিলাসে মন আর মাধুর্য মুগ্ধ হতে চায় না। নগদ পাওনার তাগিদে নিত্য দিনের জীবন বাণিজ্য বেসাতির পসরা সাজিয়ে পণ্যে পরিণত হয়ে উঠল। সমাজ চলেছে ক্রুর সর্পের মত এঁকে-বেঁকে। সে চলার গতি আছে কিন্তু ছন্দ পতন ঘটে গেছে। তাই রূপের মধ্যে লাবণ্যের লীলা নেই আছে রূপোপজীবিনীর বিশাল কলা। তনু দেহের বৈভবে লাবণ্যের মাধুর্য্য নেই, আছে ভোগ লালসার উদগ্র আসক্তি। অখণ্ড জীবন-দৃষ্টিতে রূপাতীত কল্প লোকের অফুরন্ত বিমূর্ত তন্ময়তা নেই—তাই শিল্পের রস-রূপায়ন রূপময়তায় পরিসীমিত। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার ব্যাপকতা আসর জাঁকিয়ে বসল। সাংস্কৃতিক জীবনের রূপায়ণই তো জাতীয় জীবনের সাহিত্যে, নাটকে, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় বিকাশমান। বর্তমান সমাজজীবন তার বহু কালের পরিচর্যায়িত কাব্য জীবনের মৃদু মন্থর স্নিগ্ধ ভাব-প্রবহমান মন্দ গতি সৌন্দর্যের জগৎ থেকে সরে এসেছে। তাই কাব্যাত্মিক নাট্য বা কাব্যনাট্যের স্থান নেই। গীতি কবিতারও নেই। কিন্তু তার পরিবর্ত রূপে যা স্থান লাভ করলো তার মধ্যে সৌন্দর্য-মণ্ডিত অখণ্ড জীবনের রসস্ফূর্তি নেই। আছে খণ্ড জীবনের বিশেষ বক্তব্যকে প্রকাশের তাগিদ। আর সেই তাগিদের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উন্মত্ত লালসা।

লালসা জর্জর ভোগোন্মত্ত জীবন রূপের পসার শুধু কামনার চরিতার্থতা চায়। হৃদয় বৃত্তির চেয়ে যেখানে প্রবৃত্তির তাড়না প্রবল। প্রবৃত্তির তাড়নার প্রাধান্য আর ভোগ লালসার উন্মত্ত তা-ই আজ সাংস্কৃতির আলোয় আবির্ভূত। থেমটার যে সুর রবীন্দ্রনাথ মোচর দিয়ে ভব্যতায় আসীন করেছিলেন সঙ্গীতের আলোয় সেই থেমটাই তার অকৃত্রিম রস পরিবেশন করে চলেছে।

কোমল হৃদয় বৃত্তি আর প্রেমের সার্বজনীন রূপের ভাবোদ্বেলতায় সংস্কৃতির আবেদন। তার চলার ছন্দে, গতি প্রকৃতির আবেশ-আলিম্পনে বৃহৎ জীবনের মহান সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে। প্রাণের সে উৎকণ্ঠিত আবেদন কঠিন কোমল সংবদ্ধ স্নিগ্ধ প্রকাশ-কলায় শিল্পায়িত হয়ে ওঠে। আর তার বৈপরীত্যে রয়েছে আদিম প্রবৃত্তির উদ্দামতায় দেহ ভোগের স্থূলতম বাসনা, রূপের ব্যভিচার বৃত্তিতে উপজীবিকার ক্লিন্ন আসক্তি, যৌনচেতনা থিন্ন কাম-লালসার সংযমহীন উন্মত্ত আবেগ। তার মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রাণের কোনো স্পর্শ থাকতে পারে না। বর্তমানে নৈরাশ্য ও ক্ষুব্ধ বঞ্চনা বিদ্ধ স্বার্থ মগ্ন জীবন চেতনা আপনাকে প্রকাশিত করার এক অদ্ভুত পথ অনুসরণ করে চলেছে। বিকৃত বিগহিত নৈরাশ্য-হতাশা পীড়িত

ক্লেদময় ক্লীব পশু মনের লালসা জর্জর নগ্নতা আর কদর্যতার কুণ্ঠাহীন নির্লজ্জ প্রকাশকেই যেন শিষ্ট সভ্যতার আধুনিকতম স্মারক বলে চিহ্নিত করতে চায়। বর্তমান কালের নানা লেখক, নাট্যকার, সাহিত্যিক, অভিনেতা শিল্পী ও গায়ক আর রূপোপজীবিনী নৃত্য পটীয়সী নিজেদের সমাজে বদ্ধ এক বিশেষ শ্রেণীর জীব রূপে গণ্য করে বিকৃত বিগর্হিত রুচির মাধ্যমে প্রকাশ করে তুলে নতুনত্বের দাবী করে চলেছে। কিন্তু তাদের এই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি-মাধ্যম সমাজ সংস্কৃতির পুরানে বর্ণিত যুগের ছিন্নমস্তা রূপেরই পরিচয় বহন করে।

মনের গভীরে আদিম চিত্তবৃত্তির তাড়নায় যে বাসনা স্বতঃ উৎসারিত, ভোগ লালসার যে কামনা অন্তরের অন্তস্থলে স্বতঃস্ফূর্ত,জৈবচেতনায় যার উদগ্র আবেগ-স্ফূর্তি সাংস্কৃতিক সমাজ তাকে নানা রূপে রসে রঙে ভাষার আবরণে সজ্জিত করে শুচি শুভ্র শুদ্ধ স্নিগ্ধভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই তত্ত্বকে আবিষ্কার করেছে—তাকেই নাম দিয়েছে নন্দন তত্ত্ব। তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে অভিব্যক্তির আনন্দ। সেই আনন্দের লীলাই লীলায়িত হয়ে উঠেছে সংস্কৃতিতে। তার মধ্যেই অভিব্যক্তি করেছে সত্য শিব সুন্দরের শাশ্বত রূপ। তার যে ব্যতিক্রম তাকেই আজকের বিদগ্ধ রুচিবান মানুষ অপসংস্কৃতি বলে ধিক্কার দিয়ে চলেছে। বর্তমান সমাজ-চেতনা আত্মস্থিত হলেই উপলব্ধি করবে এ ধিক্কার অমূলক নয় এর পিছনে রয়েছে শাশ্বত কালের আত্মস্থ আনন্দময় মানবাত্মার কল্যাণ প্রার্থনা—

তমসোমা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতঙ্গময়। অসদোমা সদ্গময়।

বঙ্গদেশের দুইজন বিজ্ঞান সাধক

দেবনাথ বসু

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারার দিকে যদি সামান্যতম নজর-টুকুও দেওয়া যায় তাহলে একটা বিশেষ ব্যাপারে আমাদের বিস্ময়ে আবিষ্ট হতে হয়। তার কারণস্বরূপ একথা বলা যায় যে প্রায় সভ্যতার প্রতি ধাপেই আমরা একটা ব্যাপার প্রত্যেকবারই খুঁজে পাই—তা হলো মানুষের জানার পিপাসা, অদম্য কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা। ইতিহাস রচনার গোড়ার কাল থেকে আজ অবধি মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্গীই হলো এই অনুসন্ধিৎসা। যার পরি-

প্রেক্ষিতে মানুষ সভ্যতার শিখর যাত্রায় পথপরিক্রমা শুরু করে। পৃথিবীতে মানুষ যত জানার জন্য যুদ্ধ করেছে তত যুদ্ধ বোধ হয় অন্য কোন ব্যাপারে হয়নি। এই অন্তহীন যুদ্ধের সেনাপতি যাঁরা ছিলেন তাঁরাই আবিষ্কারের ভগীরথ। কাঁধে করে সভ্যতার সুরধুনী নামিয়ে এনেছিলেন মর্তে। যাঁদের জানার মাঝেও অজানার প্রতি ছিল প্রবল আসক্তি; যাঁরা সীমার মাঝে অসীমের আরাধনার উৎসর্গীকৃত, যাঁরা ষোলআনার মাঝে দুই আনা অজ্ঞানতাকে চোদ্দআনা জ্ঞানের চেয়েও তীব্র করে দেখেছিলেন। সেই সমস্ত রূপকার রূপদক্ষ সেনাপতিরাই অজ্ঞান-অজানার আঁধার পেরিয়ে অন্ধকারের রুদ্ধ দ্বার হাট্ করে খুলে দিয়েছিলেন জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষার কাছে, সেই সমস্ত সেনাপতি পথিকৃৎদের মধ্যে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কিত কিছু তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপনা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে কবিঃ জগদীশ

"জনম লগনে রাজটীকা যার ভালে, রাজা তাকে হতেই হবে যে কোন কালে.....।" যদি বলা যায় যে এই লোকগাথাটি কোন অজ্ঞাতনামা লোকগাথা রচয়িতা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে রচনা করেছিলেন তাহলে নেহাৎ মন্দ বলা হয় কি? বোধ হয় খুব একটা মন্দ বলা হয় না। যদিও জীবৎকালে তিনি রাজ্যহীন রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন, কিন্তু জীবনোত্তর কাল তাঁকে বিজ্ঞানের এক মহান্ সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাতা হিসেবে মানতে বাধ্য হয়। পরাধীন জাতির অপদার্থতা আর বিদেশী ব্যবসায়ীর নিষ্ঠুর লোভ আর জঘন্য নিন্দনীয় চক্রান্ত যদিও তাঁর কাছ থেকে বেতার যন্ত্র আবিষ্কারকের স্বীকৃতি ছিনিয়ে নিয়েছিল তবু নিরপেক্ষ ইতিহাসে তা স্বীকৃত হলো না। অন্যের অ আত্মপ্রচারের আত্মম্ভরিতায় তাঁর আত্মপ্রকাশের আনন্দটুকু যদিও ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, তবুও একথাটা সত্য যে 'শ্রাবণের কালো মেঘ সূর্যকে কতক্ষনই পারে ঢাকতে?'

আমাদের এই বিজ্ঞান সম্রাটের জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের নিকটেই বিক্রমপুর জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর। পিতা ছিলেন ভগবানচন্দ্র বসু, ফরিদপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতির ঢলঢলে লাবণ্য, আর দিগন্ত জোড়া সবুজের মহিমায় দোয়েল ফিঙে-শ্যামার কলকাকলিতে শৈশবের দিনগুলো ঝরে যাচ্ছিল।

ফরিদপুরে পিতার কাছে পড়াশুনার জন্য কৈশোরেই গ্রামত্যাগী জগদীশের মনে আঁচড় লাগে বহু প্রশ্নের। 'কি' এবং 'কেন'-র তাগিদে কাঁপন ধরেছিল তাঁর কিশোর মনে। আর সেই তাগিদেই পরবর্তীকালে পরীক্ষাগারের ভিতর থেকে ছুটিয়ে দিয়েছিলেন সত্যের বর্তিকা হাতে আবিষ্কারের রথ। যে রথ ছোটার পথে পথে ফেলে গিয়েছিল বেতার-যন্ত্রের রহস্য, উদ্ভিদের জীবনতত্ত্ব।

বেতার আবিষ্কারের কাহিনীর পিছনে পরাধীন জাতির অপদার্থতার আর ব্যবসায়ী মস্তিষ্কের জঘন্য চক্রান্ত ও প্রতারণার যে ইতিহাস রয়েছে তাকে নাড়া দিয়ে দুঃখবোধকে আর ইন্ধন যোগান দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই করা হয় না। তাই এক্ষেত্রে লেখক তপন চক্রবর্তীর লেখনীই যথেষ্ট,—"বিনাতারে বার্তা পাঠানোর প্রথম কৃতিত্ব জগদীশচন্দ্র বসুর। জগদীশচন্দ্র ব্যবসায়িক বুদ্ধির পাকে স্বীয় সাধনাকে নিমজ্জিত করেন নি। পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও প্রলোভনেও জগদীশচন্দ্র বার্তা প্রেরণের কৌশলকে পেটেন্ট করেন নি। মার্কোনী বিজ্ঞানী ছিলেন না। টেক্‌নিশিয়ান ছিলেন। আর ভারত সরকার ও স্বদেশবাসী অর্থ সাহায্য আর উৎসাহ নিয়ে তরুণ প্রতিভার পাশে এসে দাঁড়ায় নি। নইলে আজ জগদীশচন্দ্রের নামই বেতার আবিষ্কর্তা হিসাবে উচ্চারিত হতো"। সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ফাদার ল্যাফো এস্‌জের চিঠিতে একটি স্বীকৃতি স্পষ্ট—বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারের ব্যাপারে মার্কোনির চেয়ে জগদীশের অগ্রাধিকার-এর কথা ঘোষণা করে যেতে চাই।

পূর্বতন আবিষ্কারের চক্রান্তের গ্লানিকে বিজ্ঞান সম্রাট এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আসলে জগদীশ ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী। মানবকল্যাণে গবেষণা আর তার ফলস্বরূপ আবিষ্কারই ছিল তাঁর কাছে বড় পুরস্কার। যশ আর খ্যাতির দাবী দিয়ে তিনি তাঁর আত্মোৎস্বর্গকে পঙ্কিল করতে চান নি। তাই নীরবেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন সকল দুঃখকে। তাই থামিয়ে দেন তাঁর মহাকালের রথের ঘোড়াকে। তাই এর পর 'উদ্ভিদ প্রাণতত্ত্ব ও উত্তেজনা বহন'-এর উপর এক নতুন দিকের উন্মোচন করেন। মানুষের / প্রাণীর দেহের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। আর স্নায়ুকোষ নিউরোণ সংজ্ঞা বহনে এবং আদেশ বহনে সক্রিয় থাকে। কতকগুলি সংকোচনশীল স্নায়ু মাংসপেশীতে গিয়ে শেষ হয়। স্নায়ুসমূহ ঐ সমস্ত পেশীতে উত্তেজনা বহন করে নিয়ে তোলে, পেশীটির সংকোচন হয়। স্নায়ুর এক প্রান্তকে উত্তেজিত করা হলে অপর প্রান্তটিতে পেশী স্পন্দিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় স্নায়ু উত্তেজনা বহন করে। উদ্ভিদেও এধরণের

প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আচার্য জগদীশ তাঁর নবতম আবিষ্কারটি ঘোষণা করেন। উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার বেগ নির্ণয়ের জন্য জগদীশচন্দ্র বসু একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তার নাম সমতাল তরুলিপি যন্ত্র। তার বিজ্ঞান সাধনার সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা হিসাবে বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের চেয়ে এটা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

আমাদের এই মহান্ বিজ্ঞান সাধক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর। জীব-জীবন ও প্রকৃতির গোপন রহস্যের চাবিকাঠি যিনি সারা জীবন খোঁজ করলেন, তিনি শুধুমাত্র বিজ্ঞানী নন, তিনি রূপদক্ষ-ঈশ্বরপূজারী, তিনি কবি—তিনি শিল্পী। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্যার মাইকেল স্যাডলার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান এই বলে :

জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন কবি।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সাধক : সত্যেন বসু

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে যে সব মনীষীর অবদান বাংলার ইতিহাসে অক্ষয়নীয় মনীষার নিদর্শন রাখেন তাঁদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র-এর মতই সত্যেন বসুও এক অবিসংবাদী নাম। শুধু বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর নাম যদি পৃথিবী মনে রাখে তাহলে আধখানা পরিচয়েই অমর হতে হবে তাঁকে। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে মূল্যায়ণ তখনই করা হবে যখন তাঁকে বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতী-সংস্কারক হিসাবে বিচার করা হবে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী কলকাতায় সত্যেন বসুর জন্ম হয়। তাঁর ছাত্রজীবনে তিনি যে গভীর মেধার পরিচয় রাখেন তা বাংলায় প্রচলিত গল্পের রূপধারণ করেছে। পদার্থ বিজ্ঞানে বহু পাণ্ডিত্য অর্জনের পর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে রীডার পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। সেখানে তাঁর জীবনে এলো এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। এক্সরে ক্রিষ্টালোগ্রাফিতে নবমূল্যায়ণ তাঁকে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী মহলের প্রথম সারিতে নিয়ে এলো। এর পর বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক ও নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞানে আবিষ্কারের মধ্যকার গাণিতিক বিরোধ ও শূন্যতা পূরণের চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে রচনা করেন 'প্ল্যাঙ্ক সূত্র ও কোয়ান্টম' নামক একটি পুস্তক। যাতে তাঁর জ্ঞান ও পারদর্শীতার চরম নিদর্শন ছিল। তিনি প্ল্যাঙ্কের 'কোয়ান্টম সূত্র'-এর উপর গাণিতিক পারদর্শীতায় প্রচলিত তড়িৎ গতিতত্ত্বের সহায়তা না নিয়েই প্ল্যাঙ্ক সূত্রের সহগ বার করলেন।

প্ল্যাঙ্কের সহগ নির্ণয়ের এত সরল ও সুন্দর গাণিতিক পদ্ধতি দিগ্‌বিজয়ী বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনকেও অভিভূত করল। আইনষ্টাইনের নিকট সত্যেন বসুর পাঠান একটি নিবন্ধ সম্বন্ধে তাঁর মতামত : প্ল্যাঙ্কের সূত্র থেকে বসুর উদ্ভাবন আমার মতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতিটি বিশুদ্ধতম কোন গ্যাসের কণিকা শক্তির তত্ত্বও ব্যাখ্যা করে। পৃথিবী জুড়ে সাড়া তুললেন বসু। 'বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন নামে পরিচিত হলো এ আবিষ্কার।

বিজ্ঞানী বসু সাফল্যের চরমে কিন্তু বিজ্ঞানী হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করে গেলেন না শুধু। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারক হিসাবে বাঙ্গালী হৃদয়ে অনন্য আসন করে নিলেন তিনি। তিনি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার যে পন্থা গ্রহণ করেছিলেন আজ তার সুফল আমরা ভোগ করছি। তাঁর মতে মাতৃভাষাই বিজ্ঞানকে প্রসারে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সাবলীল করতে পারে। তাঁর আহ্বান দেশ অগ্রাহ্য করতে পারেনি। তাই আজ মাতৃভাষা বিজ্ঞান তথা শিক্ষা বিস্তারের সর্বাপেক্ষা আদৃত ও জনপ্রিয় মাধ্যম।

সংস্কৃতি সংবাদ

শত বর্ষে পিকাসো

এবছর ২৫শে অক্টোবর মহান শিল্পী পাবলো পিকাসোর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। ১৮৮১ সালে স্পেনের মালাগা শহরে তাঁর জন্ম। বাবা হোসেকইজ ব্লাসকো ছিলেন স্কুলের চিত্রকলা-শিক্ষক। মার নাম মারিয়া পিকাসো লোপেজ।

পিকাসোর ছাত্রজীবন শুরু হয় বারসেলোনার আকাদমীতে। পরে মাদ্রিদে আসেন। এবং এখানেই বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র-ভাস্কর্য, কাঠ-খোদাই প্রভৃতি অনুধাবন করলেন। এরপর তিনি ১৯০০ সালে পারীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পারী তখন নতুন শিল্প সমাগমে মুখর। পল সেজাঁ, ভিনসেন্ট ভ্যান গগ্, পলগগ্যাঁ, আঁরি মাতিস এরা সকলেই তখন পরিচিত নাম। কেউ সদ্য মৃত। পারীতে তখন কিউবিস্ট আন্দোলন সবে রূপ পরিগ্রহ করছে। ইতিপূর্বে

সেজাঁর দক্ষিণ-নিসর্গ চিত্রমালা প্রদর্শিত হয়ে গেছে। সে চিত্রমালাকে গাঢ় জমিন (solid) বক্ররেখা এবং শীর্ষদেশে টালখাওয়া (জাকিং) কিউবিক আকারের পূর্বসূরী বলা যায়। কিউবিস্ট শিল্পীরা সবকিছুর আকারের আদি রূপ বলে রসায়ন শাস্ত্রের থেকে কেলাস বা ক্রস্টালকে গ্রহণ করলেন। পিকাসো এই নতুন শিল্পরীতিরই কাজে মেতে উঠলেন।

কিউবিস্ট পর্বের প্রথমে পিকাসো বহুভুজ দিয়ে আকৃতিকে পূর্ণরূপ দেবার কাজ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে পূর্ণরূপকে ছড়িয়ে দিলেন ভাঙা আকারে। মনে রাখতে হবে ফোটোগ্রাফি আবিষ্কারের পর পুরো অবয়ব আঁকার প্রয়োজন ফুরলো। ইমপ্রেসনিস্টদের বর্ণের পূর্ণ ব্যবহারে রঙের কাজকর্মের সীমাও ইতোমধ্যে হারিয়ে গেল। ফলে রঙের চমক ফুরিয়ে যাওয়ায় নিউ ইমপ্রেসনিস্টরা অতি জটিলতায় ও বৈজ্ঞানিক শীতলতায় ছবির চারিত্র সংজ্ঞা দিলেন। এর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় নতুন শিল্পীদের মনে হলো, শিল্প আসলে কলাকর্ম, প্রকৃতির নিখুঁত চিত্রণ নয় বরং তা শিল্পীর আবেগের রূপায়ণ। কবি গুইলোম অ্যাপলোনিয়ে পিকাসোর এই নব চিত্রণের অন্যতম পরিপোষক ছিলেন।

পিকাসো প্রথমে মাতিসের প্রভাবে হয়েছিলেন ফভিস্ট, ব্রাকের সঙ্গে কিউবিস্ট, আন্দ্রে ব্রেতোর এবং দালির সঙ্গে সুররিয়ালিস্ট, তবু পিকাসো-পিকাসোই।

রুশ বিপ্লবের চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের আবেগ জাগিয়ে তোলে। স্পেনে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের (১৯৩৬) সময় গুয়ের্ণিকা শহরের ধ্বংসাবশেষের সংবাদে ফ্যাসীবাদের মানব-বিধ্বংসী কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত, ক্রুদ্ধ, বেদনার্ত, শ্রেষ্ঠ মানবতাধর্মী শিল্পী পিকাসো গুয়ের্ণিকা ছবিটি আঁকেন। ১৯৩৭ সালের পারীতে স্প্যানিশ প্যাভেলিয়নে প্রদর্শনীটি গোটা বিশ্বের মন জয় করে নেয়। শোনা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন অধিকৃত ফ্রান্সে এক জার্মান সৈনিক ছবিটি দেখে পিকাসোকে প্রশ্ন করে, 'এ ছবি আপনি এঁকেছেন ?' পিকাসো উত্তর দিয়েছিলেন 'না, তোমরা এঁকেছ।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ফ্যাসিস্ত বিরোধী যুদ্ধে পিকাসো তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে যোগ দেন। গোপন আস্তানা ও স্টুডিওয় চলে তাঁর কাজকর্ম। এ সময় তিনি কমিউনিস্টদের বীরত্বে আকৃষ্ট হন এবং যুদ্ধের পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনের অন্যতম কর্মী ছিলেন পিকাসো ; যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছিলেন এক সংগ্রামী যোদ্ধা।

লু-শুন শতবর্ষ

এবছর চীনদেশের মহান শিল্পী লু-শুনের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। ভবিষ্যৎ যার ছিল অনিশ্চিত, এক দরিদ্র সাধারণ ঘরের ছেলে কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন কালজয়ী কথাশিল্পী।

শৈশবে অসুস্থ পিতাকে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখেন তিনি। চিরাচরিত প্রথার হাতুড়ে চিকিৎসাই সে সময়ে ছিল একমাত্র উপায়। লু-শুন এরপর মা'র প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও নানকিং-এ কিয়াংনান ন্যাভাল অ্যাকাডেমীতে ভর্তি হন। সেখানে বিজ্ঞানের শরীরবিদ্যা ছাড়া আর সব বিষয়ই পাঠ্য ছিল। ডাক্তারি বিদ্যায় তাঁর অনুরাগ থাকায়, আধুনিক ডাক্তারী পড়ার স্বপ্ন তাঁর মনে এল। তিনি জাপানে গিয়ে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন। কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায়। এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে কেবলমাত্র সুস্থ-সবল শরীরই মানুষের যথেষ্ট নয় ; কেননা ভীরুতা মানসিক দুর্বলতাও মানুষের একটা অভাব বা অসুস্থতা। নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ হবার পূর্ব্বেই তিনি চৌকিও ত্যাগ করেন এবং সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় ব্রতী হন। তিনি কলা বিভাগে যোগদান করেন এবং কয়েকজন ছাত্র মিলে 'নতুন জীবন' নামে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। যদিও শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা অর্থাভাবে বিফল হয়।

ক্রমে লু-শুন সঙ্গীহীন হয়ে পড়েন। যুযোচিত উদ্যম তিনি হারিয়ে ফেলেন। একাকী দিন কাটত তার পুরনো পুঁথি নকল করে। এই সময় তাঁর পুরনো এক বন্ধুর অনুরোধে প্রথম গল্প লেখেন "এক পাগলের ডায়রী।" এরপর একে একে লিখে চললেন বেশ কিছু ছোট গল্প। ক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জীবন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি। আজ তাঁর দেশের বাইরেও গল্প পাঠকদের মধ্যে চীন দেশের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, এবং পরবর্তীকালে জাপ-মার্কিন-

বৃটিশ প্রভৃতি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যের চূড়ান্ত রূপ দেন। কুওমিনটাং-এর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। রুশ লেখক গোগোল তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি বড় অনুবাদকও ছিলেন। কবি ও লু-শুনের নাম জানেন না এমন একজন পাওয়াও কঠিন।

মির্জো তুরসুনজাদা

মির্জো তুরসুনজাদা তাঁর কবিতা আবৃতি করতেন ছন্দময় গতিতে, উদাত্ত কণ্ঠে—দূরে আঙুল তুলে। মুগ্ধ শ্রোতা নির্বাক হয়ে শুনতো। তাঁর কণ্ঠস্বর তাজিকিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে দেশের সীমা ছাড়িয়ে এশিয়া আফ্রিকার আকাশে বাতাসে আজও অনুরণিত।

১৯১১ সালে তাজিকিস্তানের কারটাগ গ্রামের ছুতোর মিস্ত্রীর ঘরে মির্জো তুরসুনজাদার জন্ম। ছুতোরের ছেলের ভাগ্যে পড়াশুনার কোন সুযোগ ছিল না তখন। কিন্তু ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব শিক্ষার দ্বার উন্মোচনা করল। তাজিকিস্তানের কারিগর পুত্র জগতে খ্যাতিমান হলেন কবি হিসাবে।

ফেরদৌসী-হাফিজ-ওমর খৈয়ামের দেশের এই কবির রচনায় বিশ্ব সৌন্দর্য উপলব্ধির আনন্দ মানুষের সৃষ্টির শুভ কামনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিফলিত। তাঁর কবিতা সকল শ্রমজীবী শান্তিকামী মনুষের উদ্দেশ্যে। আধুনিক ও প্রগতিশীল তাজিক কবিতার তিনি ছিলেন একজন পথ-প্রদর্শক ও স্থপতি। সারা বিশ্বের প্রতিটি জাতির উজ্জল ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলি। তিনি ছিলেন একজন অ্যাকাডে-মিশিয়ান, লেনিন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজেতা কবি। ভারত বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ১৯৪৭ সালে নিখিল এশীয় সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি প্রথম ভারতে আসেন। পরেও একাধিকবার এসেছেন। বিপ্লবী মহেন্দ্র-প্রতাপের লেনিন সন্দর্শনে গমনকে নিয়ে তাঁর 'গঙ্গা থেকে ক্রেলিন' একটি অনবদ্য গাথা কবিতা। ভারতীয় বিষয় নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। ১৯৭৭-এ দুশানবেতে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এ বছর তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত পুরস্কার পেয়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সারস্বতের কবিতার বই

রাম বসু ॥ মন্ত্রখুজি ১২·০০
মৃগাঙ্ক রায় ॥ তাসের পেখম ৫·০০
চিত্ত ঘোষ ॥ পরবাসী ঘুরে ঘুরে ৫·০০

তরুণ সান্যাল ॥ যেমন উদ্ভিদ ৫·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ নদীর নিকটে ৫·০০
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ॥ রাজধানী ও মধুবংশীর গলি ৭·৫০

অরুণ মিত্র ॥ মঞ্চের বাইরে মাটিতে ৪·৫০
মণীন্দ্র রায় ॥ জামায় রক্তের দাগ ৪·৫০

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ বৈরী মন ৪·৫০
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ॥ এই এক সময় ৫·০০
অশোক ভট্টাচার্য ॥ ল্যাংস্টন হিউজের কবিতা ২·০০

কৃষ্ণ ধর ॥ যে যেখানে আছে ৪·০০

ধনঞ্জয় দাশ ॥ পালাতে পারি না ৫·০০
রাম বসু ॥ মলিন আয়না [কব্যনাট্য] ২·৫০

জগন্নাথ চক্রবর্তী অনূদিত ॥ ঈগর গাথা ১৫·০০
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত ॥ পাবলো নেরুদার কবিতা ৪·০০
সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত ॥ অকাল ৪·৫০
চিত্ত ভট্টাচার্য ॥ পাঁকে পদ্মে ৫·০০

সিদ্ধেশ্বর সেন ॥ ঘন ছন্দ মুক্তির নিবিড় ২·০০
তরুণ সান্যাল ॥ চতুর্থ পেরেক ৫·০০
তরুণ সান্যাল ॥ অপেক্ষা কোরো অন্যান্য কবিতা ২·০০
বীতশোক ভট্টাচার্য ॥ আজার-বাইজানের প্রাচীন কবিতা ২·০০
নিরঞ্জন ঘোষ ॥ ওথে-লোর রুমাল ৪·০০

সারস্বত লাইব্রেরী ॥ ২০৬ বিধান সরণী ॥ কলিকাতা-৬

বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠতম আকরগ্রন্থ

বিশ্বকোষ

নিজের দেশকে ভালো করে জানার ও বোঝার তাগাদায় এবং সাম্প্রতিক মানুষের সমসাময়িক বৃহৎ বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানাহরণের স্পৃহা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে পরিকল্পিত।
২০ খণ্ডে সমাপ্য। ১১টি খণ্ড প্রকাশিত। মোট মূল্য ৩৪৫ টাকা।
গ্রাহক তালিকাভুক্তি কালে ২৫ টাকা এবং প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ১৬ টাকা দিতে হবে।

* * *

বোধোদয় গ্রন্থমালা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫ টি গ্রন্থের লিখছেন যশস্বী লেখকেরা। এ যাবৎ ৩০ টি প্রকাশিত। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ৩ টাকা; ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে ২ টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মহাশ্বেতা সান্যাল কর্তৃক টি. এন. প্রিন্টার্স, ২০' রাজালেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং ৩১/২ ডঃ ধীরেণ সেন সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য: এক টাকা